

উচ্চশিক্ষা

প্রদর্শক থেকেও হওয়া যায় ক্যাডার, পাওয়া যায় ঢাকার সব বড় কলেজে পদায়ন

লেখা: অরিয়ন তালুকদার, আজরিন জান্নাত সেবা, সাফিয়া জান্নাত সকাল

প্রকাশ: ২১ জুলাই ২০২৬, ১৪: ৪০



শিক্ষা মন্ত্রণালয় ফাইল ছবি

প্রদর্শক থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের এন্ট্রি পদে শুরুতে প্রভাষক ও পর্যায়ক্রমে অধ্যাপকসহ বিভিন্ন দপ্তরের শীর্ষস্থানীয় পদে আসীন হওয়ার নজির রয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে (২০ জুলাই প্রকাশিত) দেখা গেছে, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন সরকারি কলেজগুলোয় কর্মরত দশম গ্রেডের ১৪৫ জন বিষয়ভিত্তিক প্রদর্শককে এক লহমায় নবম গ্রেডের বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারে প্রভাষক হিসেবে পদোন্নতি ও পদায়ন দেওয়া হয়েছে। আইনি দিক থেকে পর্যালোচনা

করলে দেখা যায়, ২০১৫ সালের একটি প্রজ্ঞাপন (এস আর ও নম্বর ২৬২-আইন/ ২০১৫/০৫.০০.০০০০.১৭৪.০২২.০২৬.২০০)-এর মাধ্যমে ‘বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস রিক্রুটমেন্ট রুলস, ১৯৮১’ সংশোধন করে বিজ্ঞান বিষয়ের প্রদর্শকদের ক্যাডার পদোন্নতির কোটা ৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করা হয়, যা একসময় ২ শতাংশ ছিল। আইনের মারপ্যাঁচে এই প্রক্রিয়া বৈধ হলেও সার্বিক প্রশাসনিক নীতি ও মেধার মূল্যায়নের সাপেক্ষে এটি একটি গভীর অসংগতি তৈরি করেছে।

রাষ্ট্র পরিচালনার ইতিহাসে এমন কিছু সিদ্ধান্ত থাকে, যেগুলোর বৈধতা নিয়ে বিতর্ক কম, কিন্তু ন্যায্যসংগত বিষয়ে প্রশ্ন গভীর। আইন কখনো কখনো একটি সিদ্ধান্তকে অনুমোদন দেয়, অথচ সেই সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তি, সমতার ধারণা ও নাগরিকের বিশ্বাসকে নতুনভাবে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। সম্প্রতি সরকারি কলেজের ১৪৫ জন বিষয়ভিত্তিক প্রদর্শককে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের প্রভাষক পদে পদোন্নতি দিয়ে বিভিন্ন কলেজে পদায়নের সরকারি প্রজ্ঞাপন এমনই একটি নীতিগত বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

এখানে প্রথমেই একটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন। কর্মরত প্রদর্শকদের পদোন্নতির অধিকার নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালনের পর তাঁরা উন্নততর পদে যাবেন, এটি প্রশাসনের স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সেই পদোন্নতির গন্তব্য কি সরাসরি বিসিএস ক্যাডার? আরও বড় প্রশ্ন, যে ক্যাডারে প্রবেশের জন্য বাংলাদেশের লাখ লাখ তরুণকে বিশ্বের অন্যতম প্রতিযোগিতামূলক নিয়োগ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, সেই একই ক্যাডারে ভিন্ন একটি প্রবেশপথ তৈরি হলে রাষ্ট্র নাগরিকদের কী বার্তা দিচ্ছে?

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের মৌলিক দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা, সমান সুযোগ ও মেধাভিত্তিক নির্বাচনের ওপর। বিসিএস কেবল একটি নিয়োগ পরীক্ষা নয়, এটি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে একটি নৈতিক ঘোষণা যে এই কর্মকর্তা দেশের সব নাগরিকের সঙ্গে সমান প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। এই দর্শনের শক্তিই বিসিএসের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার মূল উৎস।

কিন্তু যখন একই ক্যাডারে প্রবেশের একাধিক পথ তৈরি হয়, তখন প্রশ্নটি প্রশাসনিক সীমা ছাড়িয়ে ন্যায্যবিচারের আলোচনায় পৌঁছে যায়। কারণ, রাষ্ট্র শুধু সিদ্ধান্ত দেয় না, রাষ্ট্র প্রতিটি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে একটি মূল্যবোধও প্রতিষ্ঠা করে।

আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো এই সিদ্ধান্তের প্রতীকী তাৎপর্য। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজারো শিক্ষার্থী বছরের পর বছর বিসিএস প্রস্তুতি নেন। কেউ চারবার, কেউ পাঁচবার, কেউবা ছয়বার লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিয়েও কাজক্ষিত ক্যাডার পান না। সরকারি কর্ম কমিশনের সাম্প্রতিক বিসিএসগুলোর ফলাফল দেখলেই বোঝা যায়, মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়া বা উত্তীর্ণ হওয়া বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থী শেষ পর্যন্ত ক্যাডার কিংবা নন-ক্যাডার কোনো চাকরিই পাননি শুধু শূন্য পদের সীমাবদ্ধতার কারণে।

এ বাস্তবতার মধ্যেই যদি রাষ্ট্র একই সময়ে শতাধিক কর্মকর্তাকে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত করে, তবে সেই সিদ্ধান্তকে কেবল একটি পদোন্নতি হিসেবে দেখার সুযোগ থাকে না। এটি সমান সুযোগের নীতিকে ঘিরে একটি বৃহত্তর জনআলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে।

আরও একটি প্রশ্ন অনিবার্য। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের অধিকাংশ নবীন কর্মকর্তা কর্মজীবন শুরু করেন প্রত্যন্ত উপজেলার কলেজে। তাঁদের অনেককে বিভাগীয় শহরে বা ঐতিহ্যবাহী কলেজে যেতে বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয়। অথচ নতুনভাবে ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত অনেক কর্মকর্তার প্রথম পদায়ন হয়েছে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে। উদাহরণস্বরূপ, পদার্থবিজ্ঞান বিষয় থেকে পদোন্নতি পাওয়া ৩০ কর্মকর্তার প্রথম পদায়নই হয়েছে ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর সরকারি কলেজ ও দিনাজপুর সরকারি কলেজের মতো দেশের শীর্ষ ও অভিজাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয়। প্রশ্ন ওঠে, নিয়মিত বিসিএসের মাধ্যমে আসা শীর্ষ মেধাবীরা যে পদগুলোর জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করছেন, সেগুলো কি তবে প্রদর্শকদের জন্যই ফাঁকা রাখা হয়েছিল? যেখানে ৩৬তম, ৩৭তম কিংবা ৩৮তম বিসিএস ব্যাচের জ্যেষ্ঠ শিক্ষকেরা কাজক্ষিত বদলি বা পদোন্নতির অপেক্ষায় দিন গুনছেন, সেখানে শিক্ষাগত যোগ্যতার মৌলিক পরীক্ষা না দিয়ে এসে সরাসরি দেশের সেরা কলেজগুলোয় পদায়ন পাওয়া নিয়ে শিক্ষা ক্যাডারের ভেতর তীব্র অসন্তোষ ও ক্ষোভ জমছে।

প্রশাসনিকভাবে এর যৌক্তিক ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই থাকতে পারে, কিন্তু সেই ব্যাখ্যা প্রকাশ্যে উপস্থাপন না হলে একই সার্ভিসের কর্মকর্তাদের মধ্যে বৈষম্যের অনুভূতি সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা রয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক বৈধতা (ইনস্টিটিউশনাল লেজিটিমেসি)। কোনো প্রতিষ্ঠানের শক্তি কেবল আইনের ওপর নির্ভর করে না; নির্ভর করে মানুষ কতটা বিশ্বাস করে যে প্রতিষ্ঠানটি সবার জন্য একই নিয়ম অনুসরণ করছে। নাগরিক যদি মনে করেন, একই গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য সবার পথ সমান নয়, তবে সেই প্রতিষ্ঠানের নৈতিক ভিত্তি ধীরে ধীরে দুর্বল হতে শুরু করে।

এ কারণেই বিষয়টি ১৪৫ প্রদর্শকের পদোন্নতির প্রশ্নে সীমাবদ্ধ নয়। এটি ভবিষ্যতের বিসিএস, মেধাভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও তরুণ প্রজন্মের রাষ্ট্রের প্রতি আস্থার প্রশ্ন। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা জরুরি, বিজ্ঞানাগারের সার্বিক পরিচালনার জন্য সরকারি কলেজে ‘প্রদর্শক’ পদটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অন্য ২৬টি ক্যাডারে যেভাবে পদোন্নতির সুনির্দিষ্ট নীতি রয়েছে, প্রদর্শকদের জন্যও সমমানের আর্থিক ও প্রশাসনিক অগ্রগতির পথ নিশ্চিত করা উচিত। ক্যাডার পদের বাইরে থেকেও তাঁদের যথাযথ গ্রেড ও মর্যাদা পাওয়া নিশ্চিত করা যুক্তিসংগত। কিন্তু নীতিগত বৈষম্যটি স্পষ্ট হয় অন্য জায়গায়। বেসরকারি এমপিওভুক্ত কলেজে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া প্রদর্শকেরা যেখানে প্রভাষক পদে পদোন্নতি পান না, সেখানে সরকারি কলেজের ক্ষেত্রে এই দ্বিচারিতা কেন?

তা ছাড়া দীর্ঘ তিন থেকে চার লাখ প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে আসা বিসিএস ক্যাডার শিক্ষকেরা যেখানে ১২-১৩ বছর ধরে নবম গ্রেডেই আটকে থাকেন, সেখানে এ ধরনের ব্যতিক্রমী পদোন্নতি ও পদায়ন প্রশাসনিক ভারসাম্য নষ্ট করছে। উল্টো পদোন্নতি ও ক্যাডারভুক্তি নিয়ে জটলা পাকার কারণে বিসিএস ক্যাডার সদস্যরা আদালতের বারান্দায় বছরের পর বছর মামলা লড়তে বাধ্য হচ্ছেন।

আইনের তোয়াক্কা না করে যে নীতিগত বৈষম্যকে ঢাকা দেওয়া হচ্ছে, তা মূলত কর্মসংস্থানের অপেক্ষায় থাকা কোটি শিক্ষিত তরুণের স্বপ্নের সঙ্গে এক নীরব অসদাচরণ। প্রশাসনিক খেয়ালখুশি কিংবা পুরোনো ধারার কোটাব্যবস্থা দিয়ে যদি সিভিল সার্ভিস পরিচালিত হয়, তবে তা মেধার অবমূল্যায়ন করবে এবং ক্যাডার সার্ভিসের প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা ধ্বংস করবে। বিসিএস ক্যাডারের প্রবেশদ্বার সবার জন্য সমমানের ও উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক হওয়া উচিত। অন্যথা রাষ্ট্রীয় সেবায় আসার বিষয়ে ভবিষ্যৎ মেধাভিত্তিক প্রজন্মের আস্থা চিরতরে হারিয়ে যাবে।

লেখক: অরিয়ন তালুকদার, আজরিন জান্নাত সেবা, সাফিয়া জান্নাত সকাল, শিক্ষা ক্যাডার

